সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

‘হৃদয় আল্লাহর ঘর। মানুষের হৃদয়টা তৈরি করা হয়েছে এই জন্য যে সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহ থাকবেন। সে ঘরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু ঢুকালেই শুরু হবে তোমার জাগতিক অশান্তি।’

ধানমন্ডি আট নম্বর রোডের জামে মসজিদের বৃদ্ধ পেশ ইমাম মাওলানা ইসহাক আব্দুর রহমান কথাগুলো বললেন ধীরস্থির আর অনুচ্চ শব্দে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আছরের আজান হবে, তিনি প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। তাঁর নজর একটি আরবি কিতাবের দিকে। মাথার ওপরে ঘুরছে পুরাতন ফ্যান। সেই ফ্যানের বাতাসে সাদা কাশফুলের মতো তিরতির করে কাঁপছে তার দীর্ঘ দাড়ি। সেপ্টেম্বরের শেষ দুপুর, প্রায় নীরব ধানমন্ডির রাস্তা দিয়ে বিক্ষিপ্ত বেল বাজিয়ে চলে যাচ্ছে একটা রিকশা। এরপর গুমোট নীরবতা, যেটা ধীরে ধীরে অস্থির করে তুলল ওমার রিজওয়ানকে। শুধুমাত্র নীরবতাটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য ওমার প্রশ্ন করল—

‘আমার মনে অশান্তি আপনি কীভাবে বুঝলেন?’

এই প্রশ্নে বৃদ্ধ ইমামের চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা সস্নেহে হাসির দ্যুতি।

‘বেশ কিছুদিন ধরে আমি তোমাকে মসজিদের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখছি— কিন্তু তোমাকে জামাতের নামাজে দেখি না।’

‘আর তাতেই আপনার মনে হলো আমার মনে অশান্তি?’

এই বেপরোয়া তরুণটির সাথে কথা বলতে কেমন যেন ভালো লাগছে ইমাম সাহেবের। তরুণটি তাকে একবারও হুজুর সম্বোধন করেনি। তাই একটু মজার ছলে বললেন—

‘তিন ধরনের লোক মসজিদের আশেপাশে ঘুরঘুর করে। ফকির, জুতা চোর আর মজনু। তুমি হলে মজনু শ্রেণির লোক।’

এই ইমাম লোকটির মধ্যে পিরালী কিংবা বুজুর্গি দেখানোর কোনো প্রচেষ্টা নেই, কথা বলছেন খুব সাধারণ কিন্তু বিচক্ষণ মানুষের মতো। ইমামের গাম্ভীর্য থেকে বের হয়ে এসেছেন। ওমার রিজওয়ানের সেটা পছন্দ হয়েছে। ইমাম সাহেবের এই রুমটার মধ্যে একটা মিষ্টি আতরের গন্ধ। গন্ধটা যেন হঠাৎ করেই তার নাকে এসে লাগল। ধানমন্ডি লেকের তীর ঘেঁষে প্রচুর গাছপালা আর তার মাঝে এই মসজিদটা। ইমাম সাহেবের রুমটা মেহরাবের সাথে লাগানো কিন্তু মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনটি বড় বড় কাঠের আলমারি ভর্তি বই, একটি সুন্দর করে গোছানো বিছানা তার পাশে

অফিসের মতো করে সাজানো চেয়ার-টেবিল। দর্শনার্থীরা আসলে সামনের চেয়ারে বসে। সাধারণত ইমামদের রুম এমন হয় না। ওমার ইমামের মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে। ইমাম ইসহাক আব্দুর রহমান ওমারের দিক থেকে নজর সরিয়ে তার ডান দিকের জানালা দিয়ে দৃষ্টি দিলেন বাইরের দিকে। বিশাল জানালার ওপারে গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে লেকের জলে ঝকঝক করছে রৌদ্রোজ্জ্বল ক্ষয়িষ্ণু দুপুর। সেদিকে তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। এই সুযোগে ওমার ইমাম সাহেবকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দাঁড়ানো বৃদ্ধ ইমাম খুব সযত্নে একটা দীর্ঘশ্বাস লুকানোর চেষ্টা করলেন। ওমার সেটা ধরে ফেলেছে। এই দুপুরের নির্জনতাকে আর বেশি প্রশ্রয় না দিয়ে সে প্রশ্ন করল—

'বলুন তো কি কারণে আমাকে আপনার মজনু শ্রেণির লোক বলে মনে হলো?'

জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই নুরানী হাসিতে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইমামের চেহারা। মাথা ঘুরিয়ে সস্নেহে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল তাকে, তারপর বলল—

'মজনুদের চুল থাকে উশকোখুশকো লম্বা, চোখের নিচে কালি থাকে আর পোশাক থাকে ছেঁড়া।'

ইমাম সাহেবকে ভুল প্রমাণ করার জন্য একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে ওমার বলে—

'এখনকার ফ্যাশন হচ্ছে লম্বা চুল আর ছেঁড়া জিন্স। এর মধ্যে মজনু আসে কী ভাবে?'

মোয়াজ্জিন মসজিদের মাইকে গুনে গুনে তিনটি টোকা দিল, একটা ফুঁ দিল আর গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিল।

এক্ষুনি আছরের আজান হবে।

ইমাম সাহেব কথা শেষ করার জন্য বললেন— 'যুগে যুগে সব মজনুদের একই হাল, বিচ্ছেদ-বেদনা লুকিয়ে রাখা কঠিন।'

প্রায় নির্জন ধানমন্ডিকে সরব করে হেঁকে উঠল মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ— আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর।

আজান শেষ হলে ইমাম ইসহাক চেয়ারের পাশে রাখা ছড়িটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে একটা রুবাইয়াত আওড়ালেন—

সসীমকে ভালোবেসে করেছ পূজা
ভালোবেসে হয়ে গেছ দাস
তোমার অনন্ত মন আর কারো নয়
এক অসীম প্রভুর নিবাস।

ওমার স্থির হয়ে চেয়ারে বসে আছে। ইমাম সাহেব তার পাশে এসে দঁড়ালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন— 'ওজু করে জামাতে আসো।' স্বশব্দে চেয়ারটা পেছনে সরিয়ে ওমার উঠে দাঁড়াল, বলল, 'নেশা অবস্থায় কি নামাজ পড়া যায়?' এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে ইমাম বললেন— 'নেশাই তো আমাকে মসজিদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

মসজিদ বরাবর সোজা লেকের পশ্চিম প্রান্তের বটগাছটা এখন শৈশব কৈশর পেরিয়ে তারুণ্যে পড়েছে। বটগাছগুলো বহু বছর বাঁচে। কোনো কোনোটি দুই-তিন শতাব্দী। মানুষের প্রাচীন ছাতা। একই বৃক্ষের ছায়ার নিচে বেড়ে ওঠে তিন-চার প্রজন্মের মানুষ। যে শিশু এই বটবৃক্ষের ছায়ার নিচে খেলতে খেলতে বড় হয়, সে-ই একদিন আরেক শিশুর জন্ম দিয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হয়, তারপর একদিন মরে যায়। বৃক্ষদের ভেতর বটবৃক্ষ সবচেয়ে দুঃখী বৃক্ষ। এই বৃক্ষের জীবন মানুষের মতো। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর ডালপালার ভেতর থেকে নেমে আসে ঝুরি, ধীরে ধীরে পরিণত হতে থাকে আর ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে এর প্রথম মূলটি। দীর্ঘ জীবন মানেই শোকের দীর্ঘ সফর।

উথাল-পাথাল বাতাসে লেকের ধারে এই পড়ন্ত দুপুরে বটগাছের ছায়ার নিচে বসে জীবনে প্রথমবারের মতো যেন বটগাছের দিকে তাকিয়ে আছে ওমার। পাতায় পাতায় লেগে তরুণ গাছটির গা থেকে বৃষ্টির মতো একটা আওয়াজ বের হচ্ছে। ধানমন্ডিতে বড় হয়ে ওঠা ওমারের এই জায়গাটা অনেক প্রিয়। ধানমন্ডি বয়েজে পড়া পুরো স্কুল জীবন কেটেছে এখানে, এরপর ঢাকা কলেজ, সেখান থেকে এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইকোনোমিক্সে দ্বিতীয় বর্ষ চলছে, আর নিয়মমতোই চলছে তাদের এখানকার আড্ডাটা। বটগাছটার দিকে এত মনোযোগ দিয়ে কখনই তাকায়নি ওমার। ওর বন্ধুরা এখানে আসা শুরু করে সন্ধ্যার পর থেকে, সারা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ওরা আসতে থাকে। আড্ডা চলে রাত এগারোটা পর্যন্ত। ইদানীং এদিকটায় নাকি ক্রাইম বেড়ে গেছে। ধানমন্ডি থানার সেকেন্ড অফিসার কাওসার নিয়মিত আসে। এগারোটার দিকে, এসে ওদের আড্ডাটা ভেঙে দিয়ে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন উঠে যেতে হয়। পড়ন্ত দুপুরে ইমামের রুম থেকে বের হয়ে হঠাৎ করে ওমারের মনে হলো এই মুহূর্তে এই শহরের কোথাও ওর যাওয়ার জায়গা নেই।

বুকের ভেতর ঝড়ের অস্থির তাণ্ডব অথচ শান্ত দিঘির স্থিরতা নিয়ে বটগাছের নিচে বসে বসে ওমার তার ভাবনাগুলো নিয়ে ভাবছে। এটা কি ফেন্সিডিলের ঘোর! কাশির সিরাপ খেয়ে এমন নেশা হতে পারে ওমার কখনো ভাবতে পারেনি। দ্য উইন্ডো ব্যান্ডের লিড গিটারিস্ট বন্ধু রুশোর কথায় ওর প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। শান্তিনগর কাঁচাবাজারের ভেতরে সাতসকালে ঢুকে সেদিনের প্রথম কাস্টমার ছিল সে আর রুশো। কাশির সিরাপের পরিচিত স্বাদ আর গন্ধ, একটু একটু করে আধা বোতল

খেয়ে ফেলেছিল, তাতেও কোনো নেশার ফিলিংস আসেনি। মুচকি মুচকি শয়তানি হাসি দিয়ে রুশো বলেছিল— 'ধরবে মামা, ওয়েট, আর একটা কোর্স বাকি আছে।' এরপর তাকে নিয়ে গেল মগবাজার মোড়ের তাজ রেস্টুরেন্টে। ওয়েটারকে চা-এর অর্ডার দিয়ে চোখ টিপে দিল। কিছুক্ষণ পর দুই কাপ চা আর তার সাথে এলো এক কাপ ভর্তি চিনি। কয়েক চুমুকে কাপ থেকে চা কমিয়ে সেখানে প্রতি কাপে ছয়-সাত চামচ চিনি মিশিয়ে কাপটা এগিয়ে দিল ওমারের দিকে। সেই চা খাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছিল। চোখ-কান-মুখ জুড়ে নেমে এসেছিল জমাট স্তব্ধতা আর মনের মধ্যে একটা ফুরফুরে ভাব।

'পিনিকটা আরও ভালোমতো ধরার জন্য আর একটা কোর্স বাকি আছে, চল।'

এরপর তিরিশ টাকা ঘণ্টা চুক্তিতে ওরা একটা রিকশা ভাড়া করেছিল। তাজ রেষ্টুরেন্টের সামনে সব সময় কিছু মুখচেনা স্পেশাল রিকশাওয়ালা খুব আয়েসি ভঙ্গিতে বসে থাকে, বিশেষ ধরনের কাস্টমার ধরার জন্য। রিকশা ছুটল তুফান গতিতে। চোখে মুখে যত বাতাস লাগে পিনিক ততই বাড়তে থাকে। মগবাজার থেকে ধানমন্ডি শংকর রায়ের বাজার ছাড়িয়ে রিক্সাওয়ালা ওদের নিয়ে গেছে বুড়িগঙ্গার তীরে। এরপর থেকে ওমার রুশোর সাথে মিলে পিনিক নেওয়া শুরু করল, সেটা শুধুমাত্র ফেন্সিডিলের কারণে না, বরং খাওয়ার পরের ধাপগুলোর কারণে বেশি আকর্ষণ করেছে। রুশো ফেন্সিডিল খাওয়াকে একটা ক্লাসিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। গত দুই মাস ধরে ওমার রুশোর সাথে থাকে। সারারাত রুশো তার নতুন কেনা আইবানেজ ইলেকট্রিক গিটার নিয়ে পাগলামো করে আর সেই পাগলামো মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওমার উপভোগ করে। এই দুই মাসে ওদের দুই পরিবার জেনে গেছে রুশোর বাড়ি ওমারের সেকেন্ড হোম একইভাবে ওমারের বাড়ি রুশোর সেকেন্ড হোম। অসাধারণ গিটার বাজায় রুশো, নিজের বেডরুমটাকে সাউন্ড প্রুফ প্র্যাক্টিস প্যাড বানিয়ে নিয়েছে। রুশো ওমারের ঢাকা কলেজের সহপাঠি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর রুশো ঘোষণা দিয়েছে সে আর পড়বে না। পড়বে না তো পড়বেই না, তাকে আর কোনোভাবেই পড়াশোনায় ফেরানো যায়নি। সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তার বাবা শেষ পর্যন্ত তাকে গদিতে বসিয়ে দিয়েছে। রুশোর বাবা পুরাতন ঢাকার বিশাল অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িপাতিল ব্যবসায়ী। কিছু দিন নিয়মিত সুবোধ বালকের মতো গদিতে বসেছে। গদিতে বসেই দ্রুত শিখে নিয়েছে কীভাবে ক্যাশিয়ারের চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্যাশবাক্স থেকে একটা-দুইটা বড় নোট লুকিয়ে ফেলতে হয়। রুশোর সেই টাকায় চলে তার বন্ধুদের একুশ জনের গ্রুপ। স্কুলে থাকতেই শিখে ফেলেছিল গিটার। সেটা এখন তার ধ্যান-জ্ঞান-নেশা। তার ধারণা জীম মরিসনের ভেতরে যে রেড ইন্ডিয়ানের আত্মা ছিল সেটা মরিসনের মৃত্যুর পর এখন তার ওপরে ভর করেছে। রুশো জীম মরিসনকে আক্ষরিক অর্থে পূজা করে। জীমের ব্যান্ড ডোরস-এর

অনুসরণে ফর্ম করেছে সাইক্যাডেলিক রক ব্যান্ড দ্য উইন্ডো। রুশোর ড্রাগ এডিকশন মূলত জীম মরিসনের লাইফ স্টাইলের অন্ধ অনুকরণের ফল। এতদিন শুধু গাঁজা খেত, এখন গাঁজার পাশাপাশি শুরু করেছে নতুন ড্রাগ ফেন্সিডিল। ওমার ধূঁয়া টানতে পারে না, তাই গাঁজায় তার আকর্ষণ নেই। সারারাত রুশো জীম মরিসনের লাইট মাই ফায়ার, ওয়েটিং ফর দ্য সান আর তার কবিতা এন আমেরিকান প্রেয়ার গেয়ে-বাজিয়ে ওমারকে মুগ্ধ করে রাখে। সকাল হওয়ার সাথে সাথে ছোটে শান্তিনগরের কাঁচাবাজারে। দেড়শ টাকায় এক বোতলের হাফ হাফ তারপর তাজ রেস্টুরেন্টের চিনি-চা তারপর দীর্ঘ রিকশা ভ্রমণ দিয়ে বুড়িগঙ্গা। এই চক্র ওমারকে তার অস্থিরতার ভিতরে একটা সাময়িক আরাম দিচ্ছে।

ওমার নিঃসঙ্গতাকে ভয় পায়, ভয় পায় নির্জনতা। 'একাকিত্ব' ওকে একা পেলেই নৃশংস গোপন সৈন্যবাহিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত শত তীক্ষ্ণ ছুরি যেন ওকে চিরতে থাকে, টেনে নিয়ে যায় পানির অতলে, আর সে দম নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে ভেসে উঠতে। জীবনে এই প্রথমবারের মতো তার এমন কষ্টের অনুভূতি হচ্ছে। আজ প্রায় দুই মাস পর সে একা হয়ে গেল। এই সময় তার রুশোর সাথে থাকার কথা ছিল, কিন্তু রুশো আজ গদিতে গেছে। রুশোকে এখন আর নিয়মিত গদিতে যেতে হয় না। যে ছেলে সারারাত জাগে আর সারাদিন ঘুমায় সে কীভাবে সময় মেনে অফিস করবে। অনিয়মিত হতে হতে এখন সেটাই নিয়ম হয়ে গেছে। রুশোর বাবাও তার এই বখাটে ছেলেটার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গেলেই শুধু রুশো এখন গদিতে বসতে যায়। ক্যাশিয়ারের সাথে ইতোমধ্যে তার একটা গোপন সিস্টেম তৈরি হয়ে গেছে। ওমারের জীবনের এই কঠিন দুঃসময়ে রুশো যেন একটা আশীর্বাদ। রুশোকে বেশিক্ষণ সহ্য করা কঠিন। সবার চোখে সে বড়লোকের বখাটে আর নষ্ট ছেলে। এগ্রেসিভ আর বস হয়ে থাকতে পছন্দ করে। দেদারছে টাকা ওড়াতে পারে বলে তাকে এড়ানো মুসকিল। ঘুরেফিরে রুশোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় ওদের বন্ধুত্বের সৌরজগৎ।

এত দুর্নাম থাকা সত্ত্বেও ওমার রুশোকে বুঝতে পেরেছে। রুশো ফুল অফ হার্ট। ওর সাথে নিঃস্বার্থ আর গভীরভাবে না মিশলে ওকে কেউ বুঝবে না। এই দুই মাসে ওরা পরস্পরকে বুঝে ফেলেছে। ওমারকে রুশো খুব গোপনে সমিহ করে। ওমার অন্য সবার মতো না। একাডেমিক পড়ার বাইরে ওর প্রচুর পড়াশোনা রয়েছে। স্পেশালি ষাট আর সত্তর দশকের পাশ্চাত্যের কালচারাল রেভুলেশন, কাউন্টার কালচার, হিপ্পি মুভমেন্ট আর রক অ্যান্ড রোলের উত্থান বিবর্তন নিয়ে রয়েছে প্রগাঢ় আর স্বচ্ছ ধারণা। দুজনই পছন্দ করে সাইক্যাডেলিক আর পোগ্রেসিভ রক মিউজিক। যদিও রুশো যেভাবে জীম মরিসন পছন্দ করে ওমার সেভাবে করে না। ওমারের ধারণা জীম যতটা না পপুলার তার শিল্পে তার চেয়ে বেশি পপুলার তার উশৃঙ্খল

জীবনাচারে। সেই প্রথম রকস্টার যাকে উশৃঙ্খলার জন্য স্টেজ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, আর সেই সময়টাও ছিল শিল্পের পাশাপাশি বাড়তি কিছু দেখানোর। এসবে রুশোর রয়েছ প্রবল মত বিরোধ। তার মতে শিল্পির জীবনও কখনো কখনো শিল্প হয়ে ওঠে, মরিসনের সাতাশ বছরের জীবনটাও তেমন ছিল। মিউজিকের চাইতে বেশি রুশো তার নিজের জীবনটাকে শিল্পে পরিণত করতে চায়। ওমার রুশোর এই ভুলটা ধরতে পারে, কিন্তু তাকে ঠিক শোধরাতে পারে না, এমনকি সেটার পদ্ধতিও তার জানা নেই। এইসব কিছু মিলিয়েই রুশোকে তার ভালো লাগে। রুশো জানে কী ঘটেছে ওমারের সাথে। রুশো ওমারের এই দুঃসময়টা গভীরভাবে অনুভব করতে পারছে। এই জগতে পাগল ছাড়া কেউ পাগলামোর কোনো মূল্য দেয় না। রুশোর রাত জাগা সমস্ত পাগলামোর একমাত্র মুগ্ধ দর্শক ওমার। ওমার তার কষ্টগুলো নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে না, রুশো সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে না। ফেন্সিডিলের নেশা দুজনের মধ্যে দুই রকমের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। মাত্রাতিরিক্ত কোডিন ফসফেট রুশোকে করে হাইপার আর ওমারকে করে সাইলেন্ট। সারারাত রুশো অনর্গল কথা বলে, গিটার বাজায়, হঠাৎ চিৎকার করে গেয়ে ওঠে 'ডোরস' থেকে ব্রেক অন থ্রো—

You know the day destroys the night
Night divides the day
Tried to run
Tried to hide
Break on through to the other side...

গাইতে গাইতে জীম মরিসনের মতো অদ্ভুত রহস্যময় অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে থাকে রুশো। যেন ফণা তুলে নাচছে একটা বিষাক্ত সাপ।

আলো-আঁধারির রুমের মধ্যে রুশোকে তখন আজাজিল শয়তানের মতো লাগে। ওমারের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় ওরা পরস্পরকে চিনতে থাকে। ওমারের অবাক মুগ্ধ মুখের দিকে রুশো শকুনের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নিয়ে তাকিয়ে বুঝতে পারে ওমার এখানে নেই। অস্পষ্ট আলোয় ওর ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস রুশোর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না।

সন্ধ্যার আঁধার ঘন হওয়ার ঠিক আগে আগে রুশো বটগাছের নিচে এসে হাজির হয়। ওর আসা দেখে বোঝা যায় সে বেশ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

'পিনিক আছে?'

'তুই না থাকলে কি পিনিক থাকে?'

এই উত্তরে রুশো দারুণ খুশি হয়।

'এত দেরি করলি কেন?'

'তোকে একটু একা থাকার প্র্যাক্টিস করালাম,' ওমার বোঝে এসব রুশোর জাস্ট কথার কথা। রুশোর চোখে-মুখে একটা চাপা খুশির ঝিলিক দেখা যাচ্ছে।

'আজ ভালো দান মেরেছি, আগামী এক মাস আর গদিতে যেতে হবে না,' বলেই রুশো পকেট থেকে মুঠো ভরে বের করে আনল কতকগুলো পাঁচশ টাকার নোট। নোটের সাথে সাথে বের হয়ে এলো একটা আঙুল সমান লম্বা গাঁজার পুরিয়া। পুরিয়াটা ওমারের হাতে দিয়ে দলাইমলাই হয়ে থাকা নোটগুলো সোজা করে ভাঁজে ভাঁজে পকেটে রেখে দিল। অন্য পকেট থেকে গোল্ডলিফ সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে সেটা দুই আঙুল দিয়ে টিপে টিপে নরম করে সেটার ভেতর থেকে তামাকগুলো বের করে ওমারের হাতের তালুতে রাখল। এরপর গাঁজার পুরিয়া থেকে পরিমাণ মতো গাঁজা নিয়ে সেখান থেকে অপ্রয়োজনীয় ডালপালা পরিষ্কার করে বাম হাতের তালুতে রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ডলতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে একটা বুনো ভেসজ গন্ধ ওদের নাকে এসে লাগে। মুগ্ধ রুশো হাতটা নাকের কাছে এনে দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে-

'মালটা আসামের, দেখ রংটা এখনও কেমন সবুজ।'

তালুতে গাঁজা ডলতে ডলতে রুশো ওমারের দিকে বেশ কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়ে থাকে। ভাবলেশহীন ওমার তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। গম্ভীর গলায় রুশো বলে-

'লোনলিনেসটা এনজয় করতে পারিস না?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে ওমার বলে 'হ্যাঁ পারি, তুই যদি পাছার কাপড় খুলে একটা গরম রুটি বানানোর তাওয়ার ওপরে দশ সেকেন্ড বসে থাকতে পারিস তা হলে আমিও লোনলিনেস এনজয় করতে পারব।'

ওমারের কথাটা বুঝতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে রুশোর। এবার প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ল রুশো, সেই হাসিতে যোগ দিল ওমার। রুশো চিৎকার করে হাসছে, ওমারও হাসছে সমান তালে। কতদিন পর ওমার হাসছে, হাসতে হাসতে ওর বুকটা খালি হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকারে ওদেরই সাথে বেড়ে ওঠা বটগাছটার নিচে দুই কিশোর কি এক অজানা আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাসছে। তখন হঠাৎ করেই এক ঝটকা পুবালি বাতাস এসে নাড়িয়ে দিয়ে গেল বটগাছটার ঝাঁকড়া সবুজ চুল। যেন বটগাছটাও মাথা দুলিয়ে হাসছে, যেন ওরা দুজন নয়, ওরা এখন তিনজন, ফিরে গেছে ওদের কিশোর বেলায়।

কলাবাগানের ষাট দশকের ওল্ড ফ্যাশন্ড বাড়িগুলো দেখতে অনেকটা স্কুলের মতো মনে হয়। ওমারদের বাড়িটা তেমন। প্রায় আধা বিঘা জমির ওপর তৈরি বাড়িটার পেছনে ঝাড় জঙ্গল আর বিশাল বিশাল মানকচুর গাছ। সেখানে একদল বেজির রাজত্ব। ওমারদের বাড়ির প্রতিদিনের মাছ কোটার পরের কাঁটাকুটা নাড়ীভুড়িগুলো ওদের জন্য সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। বেজির ছোট ছোট বাচ্চাগুলো নির্দিধায় ঘুরে বেড়ায় সারাবাড়ি। বাড়ির নিচতলাটা ছিল ওমারের বাবার চেম্বার। আইনের মোটা মোটা বই দিয়ে ঠাসা অফিস রুমটা। ওমারের আইনজীবী বাবার মৃত্যুর পর এখন সেটা ড্রয়িংরুমের মতো ব্যবহার করা হয়। ওমাররা চার ভাই। বড় ভাই ব্যাংকের ম্যানেজার, মেজ ভাই ঠিকাদারি ব্যবসার পাশাপাশি তাদের প্রোপার্টিজগুলো দেখাশুনা করে। ওমারের ছোট ভাই মায়ের আদরের ঘরকুনো বালক। সামনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। পড়াশুনা আর মায়ের আঁচল ধরে সারাদিন বসে থাকাই তার জীবন। এখনও মা মুখে তুলে না খাইয়ে দিলে সে খায় না। বাড়ির মূল গেটের পাশেই একটা বিশাল কড়ই গাছ। যখন কড়ই ফুল ফোটে, একটা হালকা মিষ্টি গন্ধে তাদের সারা বাড়িটা মৌ মৌ করে। সন্ধ্যার আগ দিয়ে মনে হয় সারা শহরের চড়ুই পাখিগুলো চলে আসে এখানে রাতে ঘুমানোর জন্য। শেষ রাত থেকে গাছের দখল নেয় দোয়েল পাখিরা। ফজরের আজানের আগ পর্যন্ত চলতে থাকে তাদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। দোয়েলদের প্রথম ডাকটা শুনলেই ওমার বুঝতে পারে এখন তিনটা পঁয়তাল্লিশ বাজে। প্রথম প্রথম ওমার আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করত এই সময়ের এক মিনিটও হেরফের হয় না। এই মহাবিশ্ব জগৎ এক রহস্যময় নিয়মের ঘড়িতে চলছে। দোয়েলগুলো তারই অংশ। এর পরের ঘটনাগুলোও নিয়ম মেনে ঘটছে প্রতিদিন। প্রথম দোয়েলটা ডেকে ওঠার পরপরই, খুট করে দরজা খোলার একটা আওয়াজ হবে।

শিশুদের থপথপ করে হাঁটার মতো করে একটা পায়ের আওয়াজ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে ওর ঘরের দিকে, আর সেই শব্দ শোনার সাথে সাথে ওমার এক লাফে তার বিছানায় গিয়ে গভীর ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে। স্কুল ঘরের মতো লম্বা করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে সেই আওয়াজ এসে থামবে ওমারের মাথার কাছে, তারপর চুলের মধ্যে চিরুনির মতো আঙুল বুলিয়ে আদর করবেন যিনি, তিনি ওমারের মা। তিনি শুধু ওমারের মা'ই নন, এ বাড়ির চড়ুই, বেজি, দোয়েল সবার মা। সারা বাড়ি জুড়ে একটা স্নিগ্ধ মমতা ছড়িয়ে থাকে এই মা'টার জন্য। গভীর রাতে মা

ওঠেন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে, তাহাজ্জুদ শেষ করে তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে দোয়া করেন। মৃত আত্মীয়স্বজন, স্বামী-সন্তান, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীর সমস্ত অসহায় মানুষদের জন্য তিনি দোয়া করেন। ফজরের আজানের আগ পর্যন্ত চলতে থাকে সে দোয়া। ওমারের মায়ের রুমের জানালার কার্নিসে এসে দোয়েল গুলো ডাকাডাকি শুরু করলে তিনি মোনাজাত শেষ করেন। মা জানেন, ওমার সারারাত জেগে থাকে। শেষ রাতের এই অপার্থিব সময়ে ওমার তার মায়ের মুখোমুখি হতে চায় না, তাই মা তার রুমে আসার আগেই সে ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে থাকে। মা তার মাথার কাছে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন আর দোয়াদরুদ পড়তে থাকেন। এভাবে হাত বুলাতে বুলাতে মসজিদ থেকে ভেসে আসে ফজরের আজান। আশ্চর্যজনকভাবে ঠিক তখনই ওমার গভীর ঘুমের অতলে হারিয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক সেই সময়টায় ওমার তার মায়ের যে কথাটা প্রতিদিন শোনে সেটা হলো— 'ওঠো, ফজরের নামাজটা পড়ে তারপর ঘুমাও।' ওমারের সেটা কখনই পড়া হয় না। মা আর একটি শব্দও উচ্চারণ না করে ওমারের রুমের লাইট অফ করে চলে যান।

সবকিছু এমন করেই চলছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে এসব আর আগের মতো নেই। মা এসে মাথায় হাত বুলালেও এখন আর তার ঘুম আসে না। একটা ছোট্ট অপরাধবোধ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। মায়ের সাথে করা এই অভিনয়টা তাকে এক ধরনের অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এখন আর সে নিয়মিত বাসায় থাকে না, কিন্তু যে দিন থাকে সেই রাতটা তার আরও বেশি কষ্টের মনে হয়। মাঝে মাঝে তার খুব ইচ্ছে করে মাকে তার কষ্টের কথাগুলো বলতে, কিন্তু পারে না। মায়ের হাতের স্পর্শে তার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে। একটা উথলে ওঠা কান্নাকে সে অনেক কষ্টে চেপে রাখে। না বলতে পারে, না কাঁদতে পারে, না ঘুমের অতলে হারিয়ে যেতে পারে। আজ মা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—

'আমি জানি তুই জেগে আছিস।'

ওমারের বুকটা ধক করে ওঠে, তবুও সে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে।

'বৃষ্টির আগে পিঁপড়ারা টের পায়, ঝড় বা ভূমিকম্পের আগে পাখিরা টের পায়, আর যত আড়াল করে যতদূরেই থাকে, সন্তানের কষ্ট মা'রা ঠিকই টের পায়। ইনশাআল্লাহ্ তোর সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।' ওমারের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। সেই দীর্ঘশ্বাসটাকে ধীরে ধীরে ছেড়ে ওমার সেটা লুকানোর চেষ্টা করে। ওমার জানে, সে নিজে থেকে না বললে তার মা কখনই তার কাছে জানতে চাইবে না কি তার কষ্ট। অবাধ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে ওমার আর তার ভাইয়েরা। মা ছোটবেলা থেকেই বলতেন— 'আমি তোদের ভালো মন্দের শিক্ষা দিয়ে তাকদিরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। এখন যা কিছু ঘটবে সবটাই ভালোর জন্য ঘটবে। আমার কাছে

কোনো কিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। তোদের জবাবদিহি করার জন্য আল্লাহ তোদের ভিতরে তৈরি করে দিয়েছেন বিবেক। আমার কাজ তোদের জন্য দোয়া করে যাওয়া।'

এরপর কিছুক্ষণের জন্য মা নীরব হলেন, যা কিছু পাঠ করেছিলেন সেটা একটা দীর্ঘ ফুঁ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন ওমারের মাথা থেকে পা পর্যন্ত। তারপর উঠে যাওয়ার আগে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—

'তুই কি ইসহাক হুজুরের কাছে গিয়েছিলি?'

চোখ বুজে পড়ে থাকা অবস্থায় ওমার ছোট করে উত্তর দেয়, 'হুঁ'।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মা শীতল কণ্ঠে বললেন—

'দুঃখ-কষ্টের ভার কেউ কারোটা বহন করতে পারে না। সেটা কাঁধে নিয়েই মানুষকে নির্দিষ্ট পথ আর সময় অতিক্রম করতে হয়। সাহসী আর বুদ্ধিমানেরা ধৈর্যের সাথে এই পথ আর সময়টুকু অতিক্রম করে। বোকারা চায় তার সেই ভার অন্য কারো কাঁধে কিছুটা তুলে দিতে। তোরা যেটাকে বলিস শেয়ার করা। মানুষের ভেতরের কষ্টটা অপার্থিব, আত্মিক, আধ্যাত্মিক। আত্মিক শক্তিসম্পূর্ণ কোনো মানুষ যদি তোর সেই কষ্টের সময়টুকুতে তোর বন্ধু বা চলার সাথি হয় তা হলে দেখবি তোর কষ্টের সময় আর পথ খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। এর বাইরে দুর্বল অন্তরের বন্ধুরা তোর মনের আগুনে বাড়তি কিছু খড়কুটো তুলে দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারে না। এছাড়া আদতে কষ্টের কোনো শেয়ার নেই।'

বাইরে তখন ফজরের আজান শুরু হয়ে গেছে। দোয়েলের উৎপাতে কড়ই গাছের চড়ুইগুলো শোরগোল তুলেছে। বেজির বাচ্চাগুলো সেই শব্দে গর্তের মুখে এসে ঢুলুঢুলু চোখে উঁকি মারছে। আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত মা নিশ্চুপ থাকলেন।

তারপর বললেন—

'ইসহাক হুজুরের কাছে আবার যাবি, তাঁকে আমার সালাম দিয়ে বলবি আমার মা বলেছে আমাকে আপনার বন্ধু করে নিতে।'

ধানমন্ডির ওম্যান কমপ্লেক্সের মাঠে এ বছরের সবচেয়ে বড় কনসার্টটা হচ্ছে। সেখানে মাইলস, এলআরবি, ফিলিংস, ওয়ারফেজের পাশাপাশি ওয়ার্ম আপ ব্যান্ড হিসেবে সুযোগ পেয়েছে রুশোর ব্যান্ড ইউন্ডো। রুশোর জন্য চারটি গান গাওয়ার সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কনসার্টটা রুশোর জীবনের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কনসার্ট। এই সুযোগটা করে দিয়েছে রুশোর মামা মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডি এলাকার রংবাজ তোতা। আয়োজকদের তোতা সাফ জানিয়ে দিয়েছে রুশোর ব্যান্ডকে নিলে এখানে কনসার্ট হবে নইলে হবে না। তোতাকে নারাজ করে কনসার্ট করার মতো রিস্ক নেয়নি আয়োজকরা। দশটা নতুন ব্যান্ডের তালিকার মধ্যে ছিল রুশোর ব্যান্ড, সেখানে সবাইকে টপকে রুশো চান্স পেয়েছে এটা খুব বেশি কেউ জানেনি। রুশো যখন মঞ্চে ওঠে তখন মাঠ অর্ধেক ভরেছে। লম্বা লাইনে ধীরে ধীরে তরুণ-তরুণীরা ওম্যান কমপ্লেক্সের মাঠে ঢুকছে। মোটামুটি সবার লক্ষ্য পরের ব্যান্ড ওয়ারফেজের কনসার্টটা ধরা। রুশো চারটা নিজের লেখা সুর ও কম্পোজ করা গান রেডি করে রেখেছিল। গানগুলো সাইক্যাডেলিক রক ফর্মে করা। গানের কথাগুলো এতটাই বিমূর্ত যে সেটার অর্থ বুঝতে হলে রীতিমতো গবেষণা করতে হবে। রুশো তার জানপ্রাণ দিয়ে গানগুলো গাইছে কিন্তু মাঠের মধ্যে সেটার বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া নেই। এমনকি গান শেষে কেউ তালিটুকু দিতেও যেন আলসেমি করছে। রুশো ভালো গান গায় গীটার বাজায় ওর সাথের ড্রামার বেজ গীটারিস্ট, কী বোর্ডিস্ট সবাই ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ান অথচ গানের ভিতর দিয়ে তারা আবেদন তৈরি করতে পারছে না। রুশোর চেনাজানা আর বন্ধুবান্ধব মিলে প্রায় শ'খানেক ছেলেমেয়ে মাঠের এক প্রান্ত থেকে রুশোকে উৎসাহ দিয়ে চিৎকার করছে, যেটা মাঠের বাকি দর্শকদের বেশ বিরক্ত করছে। রুশোর তৃতীয় গান থেকে দর্শকরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। হেভী মেটাল ফর্মে সে গানটি গাইছে, গানের কোথাও 'রক্তক্ষরণ' শব্দটা আছে বলে, আর সেই শব্দের সময় তাল মাত্রাজনিত একটা ব্রেক আছে বলে বোঝা যায় রুশো একটা বাংলা গান গাইছে। রুশো হার্ডকোর রকার। সে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের হুবুহু ফিলসফিটা ধারণ করে এবং সেই মিউজিকের ফর্ম ভেঙে লোকাল ফর্ম তৈরি করতে নারাজ। গভীর নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় রুশো তার গানগুলো লেখে। নেশা অবস্থায় সেগুলো শুনলে একটা ভাব আসে, কিন্তু নেশাহীন স্বাভাবিক অবস্থায় গানগুলো এতটাই দুর্বোধ্য যে অনেক সময় রুশো নিজেও কোনো কোনো লাইনের অর্থ দাঁড় করাতে পারে না। তখন রুশো আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে— 'এসব গান শুনতে

হলে তোকে ঘোরের ভেতরে ঢুকতে হবে, ঘোর ছাড়া ঘোরা যায় না রে পাগলা। ওমার বোঝে এসব ভুমভাম কথা বলে রুশো সত্য লুকায়। রুশোর ভাষায় তার গান স্পিরিচুয়াল, ভাববাদীদের গান। ভাব আনতে নেশা লাগে। 'লালনের মাজার ছেউরিয়াতে দেখিসনি, লালন সাধকেরা কেমন সিদ্ধি খেয়ে সিদ্ধ হচ্ছে।'

ওমার প্রতিবাদ করে বলেছিল 'লালন কি বলে গেছেন যে গাঁজা খেয়ে তার গান শুনতে হবে, বা চর্চা করতে হবে?'

'হ্যাঁ জীম মরিসনও তো বলেনি যে মারিজুয়ানা বা এলএসডি খেয়ে তার গান শুনতে হবে। কিন্তু তোর কি মনে হয় জীম কখনো নেশা না করে মঞ্চে কোনো গান গেয়েছে? লালন গাঁজা খেয়ে গান করেছে কি না সেটা তো আমরা কেউ দেখিনি। কিন্তু আমরা জীমকে দেখেছি মঞ্চের ওপর প্রকাশ্যে ঢকঢক করে মদ খেতে, নেশায় বেসামাল হয়ে প্যান্টের জিপার খুলতে, এসব কারণে মঞ্চে উঠে পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেছে। এসবের কারণে জীম পরিতাজ্য হলে কি সে রক আইকন হতে পারত। রোলিং স্টোনের র‍্যাঙ্কিং এ পৃথিবীর সর্বকালের সেরা গায়কদের তালিকায় তার অবস্থান ৪৭ নম্বর। ইনফ্লুয়েন্স না থাকলে তোদের চোখে এমন একজন খারাপ লোক এমনি এমনি এমন অবস্থানে পৌঁছাতে পারে?

শোন, একমাত্র গুরুই জানে কোন তরকারি কী দিয়ে রান্না করতে হয়। কীসের সাথে কি মেশালে স্বাদ হয় অমৃত। আমরা জীম মরিসনের মুরিদরা জীমের ওয়াইল্ড লাইফস্টাইল ফলো করি বলেই জীমের সাইক্যাডেলিক রকের স্বাদ নিতে পারি। সব পরম্পরা, বুঝেছিস; ছেউরিয়াতে যেভাবে গাঁজা খেয়ে লালন চর্চা হয় সেটা লালনের জীবনাচার থেকে তার মুরিদরা গ্রহণ করেছে কি না, কে জানে। আর আমার গান বুঝতে হলে লালন আর জীমের মতো ভাববাদী হতে হবে। সব শিল্পবোধে সবাই পৌঁছাতে পারে না। সবাই যেমন পারে না বর্তমান সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। মরিসনের কালচার ছিল 'কাউন্টার কালচার' একইভাবে এই অঞ্চলে লালনও ছিল একটা কাউন্টার কালচারের প্রবর্তক। লালন ছিল ধর্ম বিশ্বাস আর জাতপাতের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলিম-ধর্ম বিশ্বাসের বাইরে সে তৈরি করেছিল একটা নিজস্ব ধর্ম চিন্তা। অনেকে সেটাকে বলে বাউল ধর্ম। লালন নিজেই বলেছেন 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে। লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না তা নজরে।' এখন বুঝেছ মামা, লালন কীভাবে প্রচলিত কালচারকে কাউন্টার মেরেছে। লালনের মুরিদরা সিদ্ধি খায়, আমি মরিসনের মুরিদও সিদ্ধি খাই আর সাইক্যাডেলিক রস আস্বাদন করি। বলা তো যায় না মামা আগামী ২০/২৫ বছর পর আমার মুরিদরাও সিদ্ধি খাবে আর আমার গানের মর্ম উপলব্ধি করবে। আর বলবে আহা গুরু রুশো বর্তমানে বসে লিখেছে ভবিষ্যতের গান, বর্তমানকালের গর্দভরা বুঝতেই পারেনি কোন উচ্চমার্গে ছিল তাদের গুরু রুশো। তখন ইতিহাসে তোর নাম

লেখা থাকবে, তুই ছিলি আমার প্রথম মুরিদ, আমার প্রতি প্রথম ইমানটা তুই এনেছিলি।'

এসব কথা রুশো হালকা মেজাজে বললেও, ওমার জানে রুশো এই সব কথা তার বিশ্বাসের ভেতর থেকে বলে। আর যখন বলে তখন রুশোর ভেতর থেকে যেন অন্য কেউ কথা বলে। একমাত্র ওমারই বুঝে গেছে রুশোর লক্ষ্য শুধুমাত্র গায়ক হওয়া না। তার লক্ষ্য গুরু হওয়া। সে তার গানের ভক্ত তৈরি করতে চায় না, চায় মুরিদ তৈরি করতে। এমন মুরিদ যে তাকে প্রথমে চর্চা করবে, তারপর ধারণ করবে, তারপর তাকে পুজা করবে। ঠিক যেভাবে লালনের হার্ডকোর ভক্তরা বাউল ধর্মের নামে লালনের পূজা করে, ঠিক যেভাবে জীম মরিসনের এন আমেরিকান প্রেয়ারের মতো তার দর্শনকে পূজা করে। রুশো প্রচলিত ধর্ম মানে না, রুশো যখন বলে— 'মিউজিক ইজ মাই রিলিজিওন আর আমি হলাম সেই ধর্মের নতুন গুরু। ওমার তখন তাকে তাচ্ছিল্য করে বলে, 'ফোট্। আমাদের গুরু আজম খান।'

রুশো রেগে গিয়ে বলে 'হাইকোর্টের মাজারে আর মিরপুরের শাহ্ আলীর মাজারে গিয়ে দেখ অশিক্ষিতরা কতশত গুরুর পা ধরে বসে বসে গাঁজা টানছে। ওদের মতো তোরাও জানিস না গুরু কাকে বলে, আর গুরু হওয়ার যোগ্যতা কী?

শোন্ গুরু হতে হলে নিজস্ব দর্শন থাকতে হয়, সেই দর্শনের চর্চা থাকতে হয়। সেটা গানে গানে সুরে সুরে অথবা উপাশনার আকারে উদযাপিত হয়। একজন কথা লিখে দিবে অন্যজন সুর করে দিবে আর গায়ক লম্বা লম্বা চুল রেখে গাঁজা খেয়ে টলতে টলতে মঞ্চে সেই গান ডেলিভারি দিয়ে কয়েক হাজার ভক্তকে মাতিয়ে দিলেই গুরু হওয়া যায় না। গুরু হচ্ছে সে, যে নিজের কথা নিজের সুরে নিজের দর্শন-মতবাদ প্রচার করে। সময়ের সাথে সাথে সেই দর্শনকে ভক্তদের চর্চার ভিতর দিয়ে টিকে থাকতে হয়। এমন গুরু এই অঞ্চলে শুধু একজনই আছে সেটা লালন ফকির। আর পশ্চিমে আছে জীম মরিসন।

কুষ্টিয়ার ছেউরিয়াতে গুরু লালনের সমাধিতে যা ঘটে, একই ঘটনা ঘটে প্যারিসের প্যারল্যাসেইজ সিমেট্রিতে মরিসনের সমাধিতে।

আজম খানের সব মিলিয়ে শ'খানেক গান আছে, সেই সব গানের মধ্যে খুব বেশি হলে দশ-পনেরোটা গান তার নিজের লেখা। সেই কয়েকটা গানের ভীতর দিয়ে সে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ স্টাবলিস্ট করতে পারেনি। আজম খানকে আমি বড়জোর বাংলা রকের পাইওনিয়ার বলতে পারি, গুরু না। শোন্ এই দেশে লালনের পর গুরুর আসনটা এখনও শূন্য আছে।' বলেই চোখ টিপে দিল রুশো। নেগেটিভ হলেও রুশোর ভিতরে একটা সম্মোহন ক্ষমতা আছে। ওমার সেই ক্ষমতা টের পেয়েছে। যেটা এখন পর্যন্ত আর কেউ টের পায়নি।

প্রচণ্ড খারাপ মেজাজ নিয়ে রুশো গাঁজা ভরা সিগারেট টানছে। মঞ্চে এখন গান গাইছে ব্যান্ড ফিলিংস। তারা গাইছে গান 'মান্নান মিঞার তিতাস মলম।' পুরো মাঠ ফিলিংস এর সাথে সমস্বরে গাইছে। রুশোকে কেন্দ্র করে ঘেরাও করে ওর বন্ধুরা নাচছে আর গলা মিলাচ্ছে। সবার নজর মঞ্চের দিকে। ওম্যান কমপ্লেক্সের মাঠের শেষ প্রান্তের এদিকটার বাতাস গাঁজার গন্ধে এমন ভারী হয়ে আছে যে, সুস্থ কেউ এখানে এসে দাঁড়ালেই তার নেশা ধরে যাবে। সবাই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ওমারের নজর রুশোর দিকে। ফিলিংসের গানের সাথে উদ্দাম অডিয়েন্সের দিকে ক্রোধ নিয়ে তাকিয়ে আছে রুশো। রুশোর শো-টা আক্ষরিক অর্থেই ফ্লপ হয়েছে। ওয়ার্ম আপ ব্যান্ড হিসেবে নতুন ব্যান্ডগুলো মূলত এই জাতীয় বড় কনসার্টে কাভার সং করে থাকে, কিন্তু রুশো নিজের নাম্বার করতে যেয়ে বোকামি করে ফেলেছে। অডিয়েন্স তার শেষ গানটা আর শুনতে চায়নি, ভুয়া ভুয়া বলে তাকে স্টেজ থেকে নামিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড অপমানবোধ রাগ আর অত্যাধিক গাঁজা টানার ফলে রুশোর চোখ লাল হয়ে আছে। রুশোকে দেখে ওমারের মায়া লাগছিল। অদ্ভুত! রুশো বন্ধু, ভক্ত আর স্থাবক দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে অথচ কি ভীষণ একা। রুশো ভিড়ের ভেতর থেকে বের হয়ে শেষ প্রান্তের প্রাচীরের কাছাকাছি চলে এসেছে। বেশ একটা আলো-আঁধারি এখানে। মঞ্চে এখন এলআরবি। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে গোটা মাঠ। এলআরবি গাইছে 'হাসতে দেখ গাইতে দেখ।' রাজ্যের ক্লান্তি ভর করে রুশোর মধ্যে, বসে পড়ে সবুজ ঘাসে। বসার সাথে সাথে আরও ক্লান্তি চেপে ধরে রুশোকে, চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। মাটির পৃথিবীর হাজারো মানুষের ভিড় থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য গভীর দৃষ্টিতে তাকায় আকাশের দিকে। নিকষ অন্ধকার আকাশ, কোথাও কোনো আলো নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজেও রুশো কোনো তারা খুঁজে পেল না আকাশে। চোখ বুজে গভীর করে শ্বাস টেনে নেয়। দুই হাতের তালুকে এক করে মাথার নিচে দেয়।

'চল এখান থেকে চলে যাই'

রুশোর একই সমান্তরাল শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে ওমার।

রুশো জানত কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে ওমার চলে আসবে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে রুশো বলে—

'কোথায় যাবি, সারা শহর জুড়ে গাঁজা পুড়ছে।'

মঞ্চে তখন আইয়ুব বাচ্চুর হাতে গীটারের সলো পার্টটা কাঁদছে। ওমারের কাছে সবকিছুই বড় অর্থহীন মনে হচ্ছে। নিজের কষ্ট ভোলার জন্য ড্রাগস্ আর মিউজিকের ভিতরে ডুবে থাকতে চেয়েছে অথচ সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ভেতরের শূন্যতা যেন একটা বেলুনের মতো ফুলে-ফেঁপে বাড়ছে আর কষ্টটা

আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। কনসার্টটাকে তার একটা বন্দি কারাগারের মতো মনে হচ্ছে। সে এখান থেকে বের হতে চায়। আবার রুশো ছাড়া বেরও হতে পারবে না। রুশো যেন নিজেই একটা বিরহের সংগীত, নিজেই ড্রাগস্। তবে কি ওমার সত্যিসত্যি রুশোর মুরিদ হয়ে গেছে। আজ সবকিছুই ওভার ডোজ। দুজন পুরা দুই বোতল ফেন্সিডিল খেয়েছে আর গাঁজা কত স্টিক পুড়েছে সেই হিসাব ওরা জানে না। গুপিবাগের রমা, রুশোর সাথে কী-বোর্ড বাজায়। আজ রমা কাঁটাবনের বস্তির সব মাল মনে হয় একাই কিনে ফেলেছে। আজ ছিল রমার জন্মদিন, তার ওপর এমন গ্র্যান্ড শো।

'চল এই শহর ছেড়েই চলে যাই।'

'কই যাবি?'

'প্রথমে বুড়িগঙ্গায় যাব তারপর নৌকায় চড়ে প্ল্যান করব, কই যাব।'

'ঠিক আছে চল।'

তড়াক করে ওমার উঠে দাঁড়ায়। রুশো ঠিক সেভাবেই পড়ে থাকে। উঠতে চায় কিন্তু পারে না। কেউ যেন তাকে মাটির সাথে পেরেক মেরে আটকে রেখেছে, ওমার হাত বাড়ায় রুশোর দিকে। রুশো হাত ধরে না। একটা গড়ান দিয়ে উপুর হয়, তারপর দুই হাতে ভর দিয়ে হাঁটুর ওপরে বসে, চুলের ব্যান্ডটা খুলে ফেলে, ১২ ইঞ্চি লম্বা চুলের জঙ্গল যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেকে দেয় তার মুখমণ্ডল। আলো-আঁধারির মাঝে রুশোকে এখন ভূতগ্রস্ত নারীর মতো মনে হচ্ছে। এরপর হাতের ওপর ব্যালান্স রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় রুশো। এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল ওমার রুশোর দিকে। কেন যেন তার মনে হলো রুশোই হবে এই শহরের ভবিষ্যৎ গুরু। ঝট করে ওমারের দৃষ্টিকে ধরে ফেলল রুশো। ভুরু নাচিয়ে নিঃশব্দে জিজ্ঞেস করল, 'কী?' ওমার মুচকি হেসে বলল, 'চলো গুরু।'

বলেই এক লাফে ওমার ওম্যান কমপ্লেক্সের প্রাচীরের ওপরে উঠে পড়ে।

ওমারের মুখে 'গুরু' ডাকটা শুনে প্রথমে ধাক্কা খায় রুশো, তারপর ধীরে ধীরে তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে হাসি। 'গুরু' শব্দটা রুশোর ওপর ম্যাজিকের মতো কাজ করে। ওর যত রাগ-ক্ষোভ-অপমান ছিল সব নাই হয়ে যায়। মানুষ চায় সবাই না হোক অন্তত 'কেউ একজন' তাকে বুঝুক। হাজারো সম্পর্কের ভেতর দিয়ে মানুষ আসলে সেই কেউ একজনকেই খুঁজে বেড়ায়। এই খোঁজার জার্নিটাই জীবন।

একটা বিশাল পরিচিতির গণ্ডি থেকে ওরা দুজন এখন পালাচ্ছে। মূল গেট দিয়ে বেরোতে গেলে অনেককে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ওরা সেই ঝামেলায় না গিয়ে প্রাচীর টপকে পালাচ্ছে। ওরা ধানমন্ডি গার্লস্ স্কুলের সামনের নীরব রাস্তা ধরে পালাচ্ছে আর পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডে মাইলস্ গাইছে 'হ্যালো ঢাকা।' লেকের ধারে

পৌঁছেই ওরা পেয়ে গেল একটা বেবিট্যাক্সি। লাফ দিয়ে চড়ে বসেই রুশো বলল— সদরঘাট। বেবিট্যাক্সিওয়ালা গাইগুই করে বলল— 'না মামা অতদূর যাব না।'

ওমার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে থামিয়ে দিল রুশো। রুশোর কিছু চুল পড়ে আছে ওর মুখের ওপর। সেই চুলের ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে নেশায় ঢুলুঢুলু রুশোর লাল চোখ। সেই দৃষ্টিতে শীতল কণ্ঠে বেবিট্যাক্সিওয়ালার দিকে তাকিয়ে শুধু বলল— 'চল্'।

কে জানে কী ছিল সেই দৃষ্টিতে, বেবিট্যাক্সিওয়ালা চুপচাপ স্টার্ট দিল। নিয়ন লাইট বদলে সারা শহর জুড়ে সদ্য লাগানো হয়েছে হলদেটে সোডিয়াম লাইট। শহরটাকে এখন কেমন যেন জন্ডিস রুগির মতো মনে হয়। রংটা ওমারের পছন্দ নয়। মালিবাগের মোড় ক্রস করার সময় 'এই থাম থাম' বলে রাস্তার পাশে বেবি থামায়। সেখানে ফুটপাতে কিছু রুটি ভাজির দোকান আছে। মূলত যেসব রিকশাওয়ালা সারারাত রিক্সা চালায় তারাই সস্তায় এখানে খায়। আর খায় বিভিন্ন প্রোগ্রামে খ্যাপ মেরে বাড়ি ফেরা মিউজিশিয়ানরা, বেইলি রোডের রেকর্ডিং স্টুডিওতে রাতের শিফ্টে কাজ শেষ করে এখানে সস্তা খাবার আর আড্ডার একটা নতুন জায়গা তৈরি হয়েছে।

রুশো আর ওমারের খাওয়া দেখলে বোঝা যায় গাঁজার খিদে কত ভয়াবহ। বেবিটেক্সিওয়ালাকে নিয়ে ওরা পেটপুরে তৃপ্তি সহকারে খায়। বেবি ড্রাইভার এখন ওদের বুঝে গেছে। প্রায় ওদের বয়সি ড্রাইভারের ভিতরে একটা বাউলা বাউলা ভাব আছে। মধ্যরাতের প্রায় নীরব শহরকে বেবিটেক্সি তার উৎকট ভটভট শব্দে বিরক্ত করতে করতে ছুটছে সদরঘাটের দিকে।

চাঁদপুর আর বরিশালগামী শেষ লঞ্চগুলো চলে গেছে অনেক আগে। একটা অস্বস্থিকর নীরবতা নেমে এসেছে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে। ওয়াইজঘাট, জিনজিরা যাওয়ার কয়েকটি খেয়া নৌকা ছাড়া নদীটাও প্রায় শুনশান। অনেক দরকষাকষির পর ৭০ টাকা ঘণ্টায় রাজি হয়েছে একটা খেয়া নৌকার মাঝি। মাঝি মূলত জেলে, মাঝে মাঝে খেয়া ঘাটে ট্রিপ মারে। রুশো আর ওমারকে নিয়ে মাঝি বাবুবাজার বাদামতলীর দিকে বৈঠা মারা শুরু করল।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলো।'

রুশোর এই কথায় মাঝি কেমন থতমত খেয়ে যায়। তবুও সাহস করে মাঝি জানতে চায়,

'কেন মামা, অন্ধকারে যাইতে চান কেন, মতলব কী?'

রুশোকে থামিয়ে দিয়ে ওমার বলে—

'তুমি মিঞা মানুষ দেখে বুঝ না, হ্যায় হলো গায়ক, আমাদের গুরু। গুরু আজ গ্রহ-নক্ষত্র, তারকা দেখবেন। শহরের আলোর ভিতরে কি তারাভরা আকাশ

দেখা যায়! তুমি ভয় পাইয়ো না, আমাদেরকে ঘুটঘুটা অন্ধকারের ভেতরে নিয়ে চলো। তারপর নদীর মাঝ বরাবর নিয়ে চুপচাপ বইসা থাকবা।'

খেয়া পারাপারের বেশ বড়সড়ো নৌকাটা, পাটাতনের ওপর একটা শিতল পাটি বিছানো। দুই বন্ধু টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। মাথার নিচে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝি একটা বিড়ি ধরিয়ে বেশ জোরে জোরে বৈঠা মেরে নৌকাটাকে মাঝ নদী বরাবর নিয়ে যায়। মাঝির গন্তব্য গভীর অন্ধকারের দিকে। নৌকা যতই এগোতে থাকে টার্মিনালের শব্দগুলো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে। ঘণ্টাখানেক চলার পর ঢাকা শহরটাকে দূরের আলেয়ার মতো মনে হয়। আরও ঘণ্টা খানিক চলার পর শহরটাকে আর দেখা যায় না। নদীর দুই পাড়ে নীরব-নিস্তব্ধ, গ্রাম, হাঁট-বাজার আর ফসলের মাঠ। সম্ভবত এটা ঘোর অমাবশ্যা। মাঝি তাদের ঠিক জায়গামতোই নিয়ে এসেছে, তাকে কিছু বলা লাগেনি, মাঝ নদীতে নৌকাটাকে সে স্থির করে রেখেছে। শান্ত বুড়িগঙ্গা। নৌকাটা অদ্ভুত ছন্দে মৃদু মৃদু দুলছে। জমিনের গভীর অন্ধকার উন্মুক্ত করে দিয়েছে অনন্ত অসীম গ্রহ-নক্ষত্রের ভান্ডার। যেন পার্থিব অন্ধকার খুলে দিয়েছে শত শতাব্দীর অতলে লুকিয়ে থাকা অপার্থিব গুপ্তধন। অন্ধকারের এমন সৌন্দর্য ওরা আগে কখনো দেখেনি। মহাশূন্যের এমন ভয়াবহ সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে ওদের নেশা কেটে যায়। অপার বিহ্বলতায় বাকরুদ্ধ। নৌকার গায়ে লেগে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দটুকু যেন আরও গভীর করে তুলছে অন্ধকার কবরের নিস্তব্ধতা। একটা দীর্ঘ নীরবতার পর অস্ফুটে ওমার উচ্চারণ করে—

'ওহ মাই গড, ইটস এমেইজিং।'

তারপর আবার সব চুপচাপ। এই নীরবতা ভাঙার জন্য রুশো বলল—

'বল দেখি, পৃথিবীতে যত মানুষ আছে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যদি মহাকাশের প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে একজন মানুষের ভাগে কয়টা করে তারা পড়বে?'

রুশো জানে আউটার স্পেস নিয়ে ওমারের ভালো পড়াশোনা আছে। ওমার নিজেও মহাবিশ্বের বিশালতা নিয়ে ভাবছিল, মহাবিশ্বের এই বিশালতার মাঝে কত ক্ষুদ্র এই মানব জীবন। ওমার ভাবছে ক্ষুদ্র এই মানুষের সামনে কেন মেলে ধরা হয়েছে এই বিশালতা। মানুষ যত বেশি বিশালতার জ্ঞান লাভ করছে ততই নিজের ক্ষুদ্রতা টের পাচ্ছে। সসীম মানুষের ব্রেন ধারণ করে অসীমের জ্ঞান। সেই জ্ঞান লাভ করার পর লোভী মানুষ অসীমকে ছুঁতে চায়, চায় অমরত্ব। ওমারের বুক চিরে বের হয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। পাশ থেকে রুশো সেটা শুনতে পায়। ওমারের পায়ে নিজের পা দিয়ে হালকা ধাক্কা দিয়ে আবার জানতে চায়—

'বল না আমার ভাগে কয়টা তারা পড়বে?'

'তোর ভাগে যে কয়টা পড়বে সেই কয়টার হিসাব বুঝে নিতে তোর এই ছোট্ট জীবন যথেষ্ট নয়।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ওমার বলে—

‘পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রসৈকত আর সমস্ত মরুভূমিতে যত বালিকণা আছে মহাকাশে তারার সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশি। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সম্ভবত তিনি মানুষকে সারপ্রাইজ করতে পছন্দ করেন। বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে মানুষ ততই সারপ্রাইজড হচ্ছে। এই যে আমরা পানির ওপরে ভাসছি, এই পানির বিশালতা জানতে মানুষকে কত হাজার বছর অপেক্ষা করতে হলো। সাধারণ ড্রপারের দশ ফোঁটা পানিতে যে পরিমাণ অণুপরমাণু আছে সেটার সংখ্যা মহাবিশ্বের মোট তারকার সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি। এবার বোঝ তোর চোখের এক ফোঁটা পানি কত ওজন আর গুরুত্ব বহন করে।’

হালকা মুডে রুশো বলে—

‘এইজন্যই তো আমি কাঁদি না।’

গভীর স্বরে ওমার বলে—

‘আর আমি চাইলেও কাঁদতে পারি না।’

পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য মজা করে রুশো বলে—

‘কেঁদে কেঁদে এত মূল্যবান মহাজাগতিক পানির অপচয় করার দরকার কি?’

একথা শুনে খুকখুক করে ওমার হেসে উঠল।

‘বাহ্ তুই চোখের পানির দারুণ একটা নাম দিয়ে দিলি— মহাজাগতিক পানি। বাস্তবতাকে যিনি ভাববাদে প্রকাশ করেন, তিনিই তো গুরু। তোর মধ্যে গুরু হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।’

আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চট করে ওমারের দিকে ফিরল রুশো। সিরিয়াস হয়ে জিজ্ঞেস করল —

‘এই তুই কি আমার লগে মজা লস। তুই দেখি আজ আমাকে গুরু গুরু করছিস। ঘটনা কী?’

‘কেন, তুই কি আমাকে তোর মুরিদ করিসনি?’

‘ওমার, আই অ্যাম সিরিয়াস!’

‘আই অ্যাম সিরিয়াস টু!’

‘যা ব্যাটা তুই মুরিদ হবি কেন, তুই তো আমার বন্ধু।’

বলে আবার আকাশের দিকে তাকায় রুশো। ঠিক তখনই মায়ের কথা মনে পড়ল ওমারের। মা তাকে ইসহাক হুজুরকে বন্ধু বানাতে বলেছেন।